অশনি-সংকেত পাঠের ভূমিকা

"বন্যার হাওয়ার মতো হা হা করে
দুর্ভিক্ষের ঝড়ে,
আসে মন্বন্তরে
কৃমির উল্লাস নিয়ে শবের ভিতরে —
তবু এরা আসে
এগারোশো ছিয়াত্তরে—তেরশো পঞ্চাশে।"

(মন্বন্তর ঃ দিনেশ দাস)

দুর্ভিক্ষপীড়িত এই নিঃস্ব রিক্ত মানুষের হাহাকারে ভরে আছে বাংলার দুটি ক্রান্তিকালের ইতিহাস। ইংরাজী ১৭৭০ বাংলা ১১৭৬ সালে হয়েছিল ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ এবং ইংরাজী ১৯৪৩ বাংলা ১৩৫০-এ হল আর এক সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ। প্রথমটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় পঞ্চাশের মন্বন্তর। স্বদেশ-বৎসল বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমটির অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে এবং আমাদের আলোচ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসটি ঐ পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত। তাই উপন্যাস আলোচনার পূর্বে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আমাদের জানা প্রয়োজন।

পটভূমি ঃ পঞ্চাশের মন্বন্তর

১১৭৬ এবং ১৩৫০—মাঝখানে ১৭৪ বৎসরের ব্যবধান। এর মধ্যে বাংলায় কোন দুর্ভিক্ষ হয়নি। ১৮৯২ এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সাময়িকভাবে কিছু খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টার ফলে তা দুর্ভিক্ষে রূপান্তরিত হয়নি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর পঞ্চাশের মন্বন্তরেই বাংলার প্রভূত প্রাণনাশ ঘটেছিল। ঐতিহাসিকেরা দুর্ভিক্ষের যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে দেখা যায়, Famine Inquary Commission, India (1945)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী মন্বন্তরে মারা গিয়েছিল প্রায় ১৫ লক্ষের মত মানুষ। তবে এই কমিশনের একজন সদস্য W. R. Aykroyd-এর মতে এই হিসেব পথের পাশে যারা মারা গিয়েছিল তাদের। সামগ্রিকভাবে এই মৃত্যুর সংখ্যা ৩০-৪০ লক্ষের মত হতে পারে।

সরকারী অনুসন্ধানী দল ছাড়া বিভিন্ন সময়ে একাধিক ঐতিহাসিক ও গবেষক পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান ও আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আমেরিকার গবেষক পল আর. গ্রিনো (Paul R. Greenough), বি. এম. ভাটিয়া এবং অমর্ত্য সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমিশন প্রদত্ত তথ্যসমূহকে এঁরা বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রয়োজনমত উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সহযোগে তা খণ্ডন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

কমিশনের রিপোর্টে মন্বন্তরের কারণস্বরূপ বলা হয়েছে প্রথমত, বাংলায় তিনবার ধান উৎপন্ন হয় ঃ (১) আমন—মে, জুন-নভেম্বর, ডিসেম্বর। (২) আউশ—এপ্রিল-আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং (৩) বোরো—নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী, মার্চ। ১৯৪২ সনে এই তিন ধরনের ধানের উৎপাদন অন্যান্য বছরের তুলনায় কম হয়েছিল। কারণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অক্টোবর মাসে সাইক্লোন এবং প্রবল বৃষ্টিপাত। তার সঙ্গে রোগ-পোকার আক্রমণ।

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৯৪২ সালের মার্চে রেঙ্গুনের পতন। ফলে সেখান থেকে চালের আমদানি বন্ধ এবং পরিণামে দুর্ভিক্ষ।

এই সময়ে চালের একটা বাজারদরের তথ্যও পাওয়া যায়। ১৯৪২-এর ১১ ডিসেম্বরে যে-চালের দাম ছিল ১৩/১৪ টাকা মণ, ১৯৪৩-এর মার্চে তা হল ২১ টাকা, মে-তে ৩০ টাকা এবং আগস্টে ৩৭ টাকা। পরে বেসরকারী রিপোর্টে দেখা গেছে অক্টোবরে চট্টগ্রামে ৮০ টাকা মণ দরে চাল বিক্রি হয়েছে।

১৯৪৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বাংলা সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে বাংলার মন্বন্তরের কারণ ব্যাখ্যা করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাকৃতিক ও সামরিক। কমিশন প্রদত্ত যে কারণগুলি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ ফসল নষ্ট, ঘূর্ণিঝড়, রোগ-পোকার আক্রমণ প্রভৃতি—তা এই প্রাকৃতিক কারণকেই সমর্থন করে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামরিক কারণের মধ্যে অবশ্যই ব্রহ্মদেশ থেকে চাল আমদানি বন্ধ হওয়ার কথা আছে। এছাড়া সরকারের পোড়ামাটি নীতি গ্রহণের ফলে পূর্ব বাংলায় বহু নৌকো আটক করা হয়। এতে জেলেদের মাছ ধরা ব্যাহত হয়। চর অঞ্চলে চাষের ক্ষতি হয়। ব্রহ্মদেশ জাপান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় সেখানের বহু প্রবাসী বাঙালী দেশে ফিরে আসে। ব্রহ্মদেশ ও আরাকানের এইসব আশ্রয়প্রার্থীদের চাপ বাংলাকে সহ্য করতে হয়। এছাড়া দেশের প্রতিরক্ষার জন্য নবনিযুক্ত সৈন্যদলের খাদ্যের যোগান দিতে হয়। তার উপর যুদ্ধোপকরণ তৈরীর জন্য বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বহু চাষী চাষ ছেড়ে এইসব কারখানায় শ্রমিকের কাজ নেয়। ফলে কৃষির উৎপাদন দেশে হ্রাস পায়। এছাড়া দুর্ভিক্ষের সময়ে অন্যান্য প্রদেশ থেকেও খাদ্যশস্য এনে দেশের খাদ্যাভাব মেটানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের তখন দুর্ভাগ্য, আসাম, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের আশানুরূপ সহযোগিতা পাওয়া যায় নি। সরকার অনুমতি দিলেও রাজনৈতিক নেতারা ও আমলারা বাধার সৃষ্টি করেছিলেন।

যাইহোক, উল্লিখিত কারণগুলি পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য পূর্ণত না হলেও অংশত দায়ী। তবে দুর্ভিক্ষ কমিশন (১৯৪৪-৪৫) সিদ্ধান্ত করেছিল—a serious shortage in the total supply of rice available for consumption in Bengal. অর্থাৎ সরবরাহ-যোগ্য খাদ্যশস্যের ঘাটতির জন্য দুর্ভিক্ষ হয়েছিল—এ মত অনেকেই সমর্থন করেন নি।

ডঃ অমর্ত্য সেন তাঁর Poverty and Famines : An Eassay on Entitlement and Deprivation গ্রন্থের The Great Bengal Famine প্রবন্ধে পঞ্চাশের মন্বন্তর

সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি দুর্ভিক্ষের বৎসর এবং তার থেকে বিগত কয়েক বৎসরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শস্যোৎপাদনের হার পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, ১৯৪৩ সনের খাদ্যশস্যের সরবরাহ তার আগের পাঁচ বছরের গড়ের মাত্র ৫ শতাংশ কম ছিল। এবং বস্তুতপক্ষে ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে সরবরাহযোগ্য খাদ্য ১৯৪১ সালের থেকে ১৩ শতাংশ বেশি ছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালে দুর্ভিক্ষ হল না। হল ১৯৪৩ সালে। ['The Current supply for 1943 was only about 5 per cent lower than the average of the preceding five years. It was, in fact, 13 per cent higher than in 1941, and there was, of course, no famine in 1941.']

এই দৃষ্টান্তে ডঃ সেনের মনে হয়েছে, সরবরাহযোগ্য খাদ্যশস্যের অনটনের জন্য বিধ্বংসী পঞ্চাশের মন্বন্তর হয়নি। 'It seems safe to conclude that the disastrous Bengal famine was not the reflection of a remarkable over-all shortage of food grains in Bengal.' বি. এম. ভাটিয়া বা পল আর. গ্রিনো অনুরূপ অভিমতই পোষণ করেছেন যে, শস্যহানি বা খাদ্যশস্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ হয়নি। দুর্ভিক্ষের আসল কারণ নির্দেশ করে অমর্ত্য সেন বলেছেন—"The 1943 famine can indeed be described as a 'boom famine' related to powerful inflationary pressures initiated by public expenditure expansion." অর্থাৎ এই আকস্মিক মন্বন্তরকে মুদ্রাস্ফীতিজনিত মন্বন্তর বলা যেতে পারে। যুদ্ধের সময়ে দেশের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং সরকারকে প্রয়োজনমত নোট ছাপিয়ে সেই ব্যয়ভার সামাল দিতে হয়। সেই অবস্থায় এক শ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর অর্থাগম ঘটে এবং কালোবাজারীরা, লোভী অসাধু ব্যবসায়ীরা দেশের সম্পদ মজুত করে সেই মজুতভাণ্ডার বেশি দামে বিক্রি করে মুনাফা শিকারের সুযোগ পায়। আমাদের দেশেও সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু শ্রমিক বা কৃষকের মজুরী সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি।

পল আর. গ্রিনো আর একটি কথা বলেছেন যে, বহুদিন দেশে দুর্ভিক্ষ না হওয়ার জন্য সরকার এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছিলেন। এছাড়া ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে বাংলার কৃষক ও কৃষির অবস্থার অবনতিই ঘটছিল। বাংলার প্রায় ৪৮ শতাংশ কৃষক ছিল ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক বা বর্গাদার। চাষের খরচ বাদ দিয়ে বাকি উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক জমির মালিককে দিয়ে চাষী যা পেত, তাতে তার সংসার চলত না। ফলে চাষে চাষীর অনীহা সৃষ্টি হয়েছিল। এতে কৃষিমানের অবনয়নের সঙ্গে কৃষকের ভাগ্যে জুটেছিল অনাহার, অর্ধাহার এবং অপুষ্টিজনিত রোগভোগ। পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাই গ্রামের এই শ্রেণীর মানুষ সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল। এই মন্বন্তরকে ডঃ সেন তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখেছেন ঃ

(১) ১৯৪২-এর আরম্ভ থেকে ১৯৪৩-এর মার্চ।

(২) ১৯৪৩-এর মার্চ থেকে ১৯৪৩-এর নভেম্বর।

(৩) ১৯৪৩-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৪-এর প্রায় শেষ দিক পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অনাহারে মৃত্যু চরমে পৌঁছেছিল এবং তৃতীয় পর্যায়ে মন্বন্তর-বিধ্বস্ত এলাকায় কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল।

প্রথমে কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলাগুলিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তারপর ধীরে ধীরে তা প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট থেকে ডঃ সেন যে

উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করলে মন্বন্তর পরিস্থিতির ক্রমাবনতির চিত্রটি স্পষ্টভাবে জানা যাবে ঃ

মানুষ না খেয়ে আছে ('People having to go without food, 10 February), তীব্র দুরবস্থা দেখা দিয়েছে ('acute distress prevails, 26 March), সম্পত্তির ধ্বংসসাধন এবং ধান্য লুণ্ঠন প্রায়ই হচ্ছে ('Crime against property increasing and paddy looting cases have become frequent, 28 March), তীব্র আর্থিক সংকট আশঙ্কা করা হচ্ছে ('major economic catastrophe apprehended', 27 April), 'ভাতের অন্বেষণে দলে দলে লোক বেরিয়ে পড়েছে, ('bands of people moving about in search of rice, 12 June), মানুষ রাস্তায় মরছে (deaths in streets, 12 June), হাজার হাজার অনাহারক্লিষ্ট ভিখারীতে শহর ভরে গেছে ('town filled with thousands of beggars who are starving', 17 July), মৃতদেহ অপসারণ করা একটা সমস্যা ('disposal of dead bodies...a problem', 27 September), তারপর ২৫ অক্টোবরের একটা রিপোর্টে-এ বলা হচ্ছে—সরবরাহ শুরু হয়েছে। কিন্তু অনাহারক্লিষ্টদের বাঁচাবার কোন আশা নেই। এরপর অনাহারের সঙ্গে মহামারী এবং ১৯৪৩ সনের ডিসেম্বরের দিকে মৃত্যুসংখ্যা চরম সীমা অতিক্রম করল। এসব হল গ্রাম বাংলার দুর্ভিক্ষের ফল।

কলকাতার চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে সরকারী নীতি নির্ধারিত হয়েছিল যে, যুদ্ধের সময়ে কলকাতার শিল্পাঞ্চলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করতে হবে। Bengal Chambers of Commerce-কে একথা জানানো হলে তারা তাদের Food Stuff Scheme-এর মাধ্যমে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ তাদের ৬২০০০০ কর্মচারীকে সাহায্য করেছিল। অনুরূপভাবে অন্য একটি Chamber of Commerce এবং কলকাতার Port Trust তাদের কর্মচারীদের সাহায্য দিয়েছিল। এছাড়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রিলিফ ফান্ড গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে Bengal Relief Committee গঠিত হয়েছিল। সরকার-নিয়ন্ত্রিত দোকানের মাধ্যমে সরকারী মজুত ভাণ্ডার থেকেও দুর্গতদের খাদ্য, বস্ত্র, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৯৪২-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩-এর মার্চ পর্যন্ত এই নিয়ম চলেছিল কিন্তু তা বিশেষ কার্যকরী না হওয়ায় পুনরায় খোলা বাজারে বিক্রয় শুরু হয়। এবং জেলাগুলিতে চালের দাম বৃদ্ধি পায়।

বস্তুত কলকাতায় প্রত্যক্ষভাবে দুর্ভিক্ষ হয়নি। গ্রাম থেকে আগত গৃহহীন, বস্ত্রহীন, নিরন্ন, কঙ্কালসার মানুষগুলির প্রেতমূর্তি দেখেই কলকাতা দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। কলকাতায় সরকারী বেসরকারী লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল। তবু মানুষকে প্রয়োজনীয় রিলিফ দেওয়া সম্ভব হয়নি, বেওয়ারিশ মৃতদেহে শহরের রাস্তা ভরে উঠেছিল। রিলিফ কমিটির হিসেব অনুযায়ী শুধু অক্টোবর মাসেই ৩,৩৬৩টি মৃতদেহ অপসারিত করা হয়েছিল।

কিন্তু সব দুঃখেরই অবসান আছে। তাই ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে আউশ ও আমন ফসল মোটামুটি ভাল হলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

অমর্ত্য সেনের হিসেব অনুযায়ী এই মন্বন্তরে মৃতের সংখ্যা মোটামুটি ত্রিশ লক্ষ। আবার অন্যান্য কারো কারো মতে এর কিছু বেশি বা কম। তবে এই হিসেব তর্কাতীত নয়। কারণ যত্রতত্র মৃত্যুর কোন সঠিক সংখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ক্ষয়ক্ষতি বিপুল।

এতদ্ব্যতীত ভারতের অভ্যন্তরে এবং বহির্ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে কয়েকটি মন্বন্তর সংঘটিত হয়েছিল। যেমন ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় প্লেগ রোগের কারণে মন্বন্তর হয়। মৃত্যু ঘটে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মন্বন্তর হয় উত্তর চীনে। কারণ খরা। আনুমানিক ১ কোটির উর্ধ্বে মানুষ মারা যায়। ১৯৪১ সালে যুদ্ধের কারণে গ্রীসেও দুর্ভিক্ষ হয় ; প্রায় ৪$\frac{১}{২}$ লক্ষ মানুষ এতে মারা যায়। ১৯৭৩ সালে খরার জন্য দুর্ভিক্ষ হয় ইথিওপিয়ায়। এরও মৃত্যুসংখ্যা লক্ষাধিক। বন্যা ও খাদ্য রপ্তানির জন্য বাংলাদেশে মন্বন্তর হয় ১৯৭৪ সালে। এতেও প্রচুর লোকক্ষয় হয়। ১৯৭৬ সালে একবার সমগ্র ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল খরার জন্য। এতেও প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৬৫ সালে বিহারেও খরার কারণে মন্বন্তর হয়েছিল। সহস্রাধিক মানুষের তাতে মৃত্যুও হয়েছিল।

তবে এক ১৮৭৬ সালের উত্তর চীনের মৃত্যুসংখ্যা ছাড়া মনে হয় বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের লোকক্ষয়ই সর্বাধিক, সরকারী হিসেবে ১৫ লক্ষ এবং বেসরকারী মতে ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ মানুষ এতে মারা যায়। তাই এ মন্বন্তর মহা মন্বন্তর।

মন্বন্তরের ফলে বাংলার ভূমিহীন কৃষক, কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র চাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসাদার, পুরোহিত, নাপিত প্রভৃতি নিম্ন আয়ের মানুষ প্রায় সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। যারা মরল তারা মরল, কিন্তু যারা বেঁচে থাকল তারা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে পঙ্গু হয়ে গেল। কত সন্তান তাদের মা বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হোল। কত স্বামী তাদের স্ত্রীকে হারাল। কত নারী পেটের জন্য বিপথগামী হল। একই ডাস্টবিন থেকে মানুষ এবং কুকুর খাদ্য খুঁটে খুঁটে খেল। ভূমিনির্ভর অভিজাত সম্প্রদায়ের পরিবর্তে সৃষ্টি হল এক বণিক সম্প্রদায়ের। আর দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায় ব্যর্থ ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি এদেশে যে শিথিল হয়ে এসেছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এই মন্বন্তর মানুষের সমূহ বিনষ্টির জন্য বাংলার ইতিহাসে হয়ে থাকল চির কলঙ্কিত এবং চির নিন্দিত। এই প্রবন্ধ রচনায় ডঃ অমর্ত্য সেনের 'Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation', ডঃ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলার আর্থিক ইতিহাস (বিংশ শতাব্দী)' এবং কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আকাল' (কাব্য) গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি।